তারিখ 20 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

প্রথম আলো

সময়ের প্রতিবিম্ব ৮ এবিএম মূসা

যেসব কারণে এমপিওভুক্তি বিতর্কিত হয়েছে

অতীতে ও বর্তমানে আওয়ামী লীগের শাসনামলের কতিপয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের সমালোচনা হয়েছে। সরকার পরিচালনার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বঙ্গবন্ধু মহান ব্যক্তিত্ব ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন—এ কথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু দক্ষ শাসক ছিলেন কি না, এ নিয়ে বিভিন্ন জন পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। এর বিপরীতে তাঁর সরকারের অনেকে সফল কর্মকাণ্ড ও পরবর্তী আওয়ামী শাসনকালের একাধিক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে স্বল্প পরিমাণে। এসব সাফল্যজনক উদ্যোগের একটি হচ্ছে শিক্ষা বিস্তারে আওয়ামী সরকার আমলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদক্ষেপ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই ধরনের একটি পদক্ষেপ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন প্রদান-সম্পর্কিত আওয়ামী সরকার প্রণোদিত প্রক্রিয়া আজ সমালোচিত, এমনকি দুর্নীতির দায়ে কলঙ্কিত।

শিক্ষা বিস্তারে আওয়ামী লীগের প্রথম পদক্ষেপটি ছিল পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন। আওয়ামী লীগ ছিল ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক। শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। সেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করে। জেলা বোর্ডের প্রাক-প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষার মান উন্নীত করল। অনেকগুলো নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। মধ্য পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের বেসরকারি উদ্যোগটি সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকার সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করল প্রায় চার হাজার। প্রতি স্কুলে চারজন করে সরকারি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলো।

বলা বাহুল্য, সেই প্রথম এবং সেই শেষ। পরবর্তী কোনো সরকার আমলে দেশে আর কোনো সরকারি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এল ১৯৯৬ সালে। শেখ হাসিনা মেয়েদের জন্য 'বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানের পদক্ষেপ নিলেন। সরকার বেসরকারি সব মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের প্রথমে শতকরা ৮০ ভাগ পরবর্তী সময়ে শতভাগ ব্যয়ভার গ্রহণ করল। এই পদক্ষেপটিই এমপিও (মাসুলি পেমেন্ট অর্ডার) নামে অভিহিত হলো। তাঁর আমলে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আমার জানামতে প্রায় ৫০০ এমপিওভুক্ত করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক। সে সময়ে চালু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার অনুপাতে ৫০০ কম ছিল না। সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতিতে এমপিওভুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হওয়ায় কোনো মহলের কোনো অভিযোগ ছিল না, কোনো বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। বিএনপি ক্ষমতায় এসে দু-চারটি স্কুলকে এমপিওভুক্ত করলেও সামগ্রিকভাবে প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হলো, আজকে যেসব বিরোধীদলীয় সদস্য এমপিওভুক্তির ডিও নিয়ে প্রশ্ন করছেন, তারাই বলতে পারবেন। তবে জনশ্রুতি হচ্ছে, আওয়ামী লীগ করেছিল, তাই তারা বন্ধ না করলেও অকার্যকর করেছিল।

আওয়ামী লীগ এবার ক্ষমতায় এসে সেই মহৎ প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করে এবার সমস্যায় পড়েছে। বেকায়দায় পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া নিয়ে অপ্রিয় রটনা হয়েছে, নিয়মনীতি অনুসরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বস্তুত এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া বিতর্কিত হয়েছে বাছাইয়ে অস্বচ্ছতা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের কারণে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, সাত বছরে জমে থাকা এমপিওভুক্তি আবেদন থেকে মাত্র ১১০০ বিদ্যালয়কে বাছাই করা ছিল একটি দুঃসাধ্য কাজ। তারপরও প্রশ্ন, কেন বাছাই-প্রক্রিয়া নিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি আর জেলাপ্রিয়তা বা আঞ্চলিকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সৎ ও নীতিমান বলে পরিচিত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেন গুঞ্জরিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ। তাঁর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে নানা অভিযোগ। সেইসব আলোচিতও হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়েছে, অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এমপিওভুক্তি স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, প্রধানমন্ত্রী

স্থগিত নয়, পুনর্মূল্যায়ন করতে বলেছেন। সে সংজ্ঞাই ব্যবহার করা হোক, আওয়ামী সরকারের একটি মহতী প্রচেষ্টা শিক্ষামন্ত্রী তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর আস্থাভাজন মন্ত্রণালয়ের কতিপয় ব্যক্তির দুর্নীতির অভিযোগ, মন্ত্রীর অনভিজ্ঞতার বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হচ্ছে। পুনর্মূল্যায়ন অথবা স্থগিতকরণ যা-ই করা হোক, অনেকে বলেছেন, বাছাই জটিলতাই একমাত্র কারণ নয়। এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রসঙ্গে ভাসা-ভাসা সত্যি-মিথ্যা অভিযোগ এসেছে 'মন্ত্রণালয়ে লেনদেনের'। তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায়, শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, দুর্নীতি নয়, অনিয়ম হয়েছে। অথচ তাঁর মন্ত্রণালয়ই এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়াটি কতিপয় নীতিমালার মাধ্যমে নিয়মভুক্ত করেছিল। সেই নীতিমালা অনুসরণে অনেক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আবেদন করেও তালিকাভুক্ত হয়নি। তা হলে নিয়ম ভেঙে অনিয়মটি কারা করেছে, অথবা এর দায়দায়িত্ব কে বহন করবেন? এই প্রশ্নের জবাব শিক্ষামন্ত্রী দেননি। তিনি পত্রিকার ভাষায়, 'দায়দায়িত্ব থেকে 'সরে দাঁড়িয়েছেন'। পরোক্ষ ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন।

এ-সম্পর্কীয় সর্বশেষ খবরটি নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানব। তার আগে বলছি, বর্তমান এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার প্রাথমিক কারণ লুকোচুরি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো এক কক্ষে রাতের গভীরে তথাকথিত বাছাই কমিটি এমপিও তালিকা তৈরি করেছে। নিশিরাতের যেকোনো কার্যকলাপ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, তিনি কি স্বয়ং অথবা 'বাছাই কমিটি' সাত হাজারের অধিক নাম পড়ে, যাচাই করে, কাগজপত্র পরীক্ষার পর তালিকাটি অনুমোদন দিয়েছেন? যেসব প্রতিষ্ঠান পেয়েছে আর যারা পায়নি তাদের প্রতিটির আবেদন কি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে 'যাচাই-বাছাই করে তালিকা তৈরি করেছেন?' এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত যদি শিক্ষামন্ত্রী বক্তিতদের জানিয়ে দিতেন, তাদের আবেদনে কী ঘাটতি ছিল। এই জন্যই তাঁর জবাবদিহিতার দাবি উঠতে পারে।

এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া ও বাছাই পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তির বিষয়টি আমার স্কুলজীবনের এক সহপাঠী, যিনি একসময় শিক্ষকতা করেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। স্বল্প সময়ে সম্পাদিত প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমি এর আগে যে মন্তব্য করেছি সেটি উল্লেখ করে জানতে চাইলাম, 'তোমার কি মনে হয় দুর্নীতি হয়নি, অনিয়ম হয়েছে? অনিয়ম হয়ে থাকলে বাছাইয়ের জটিলতার কারণে হতে পারে। তোমার কি মনে হয়, কীভাবে দ্রুত বাছাই কাজটি করা হয়েছে?' রসিক বন্ধু একেবারে হালকাভাবে বুঝিয়ে দিলেন, 'দুর্নীতি না হলেও নীতিবহির্ভূত হতে পারে। কারণ সঠিকভাবে নিয়মানুগভাবে তালিকা করা ছিল অসম্ভব ও দুঃসাধ্য কাজ। তাই আমার মনে হয়, সাড়ে সাত হাজার থেকে এক হাজার ২২টি বাছাই করতে আইয়ুবী সামরিক আদালতের পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে।' বললাম, 'সেটি কী রকম?' উত্তর এল, 'সেই রকমে, যেই রকমে আইয়ুবের সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে মামলার নিষ্পত্তি করা হতো। পেশকার গোটা পঞ্চাশেক মামলার নথি বিচারক মেজর-ক্যাপ্টেন বিচারকের টেবিলে রাখতেন। তিনি একটি নথি হাতে নিয়ে বাঁ-পাশে রেখে বলতেন, সাত বছর। আরেকটি ডান পাশে রেখে বলতেন, সাত বছর অথবা দশটি বেত্রাঘাত। ব্যস, ১০ মিনিটে ৫০টি মামলার ফয়সালা হয়ে গেল।

আমি বুঝলাম, এই পদ্ধতিকেই বোধহয় মন্ত্রী মহোদয় 'অনিয়ম' বলেছেন। বন্ধুকে সে কথা বলতেই খেপে গেল, 'দ্যাখ, অনিয়ম ও দুর্নীতি হয় না, কেউ-না-কেউ করে।' আমার উত্তর, 'তাহলে এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া অথবা নিয়ে অনিয়ম বা দুর্নীতি কে করেছে?' বন্ধু আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* পড়েছিস?' উপন্যাসটির একটি অংশ সংক্ষেপে বলছি। ব্রিটিশ আমলে একজন বিপ্লবী গাঁজাখোরের ভেক ধরে কলকাতা থেকে জাহাজে রেঙ্গুন বন্দরে নামলেন। তাঁকে ধরার জন্য বন্দরে আগে থেকেই গোয়েন্দা বাহিনী ওত পেতে ছিল। প্রত্যেক যাত্রীকে তল্লাশি করার সময় বিপ্লবী সব্যসাচীকে ধরে বললেন, 'এ্যাই ব্যাটা, গাঁজা খাস? দেখি, তোর হাত দেখি।' হাত দেখে গোয়েন্দা এবার বললেন, 'এ্যাই তো, হাতে গাঁজার পাতা দলাই করে খেয়েছিস। হাতে গাঁজার গন্ধ কেন?' সব্যসাচী উত্তর দিলেন, 'মাইরি বলছি স্যার, আমি খাইনি। আমার হাতে কে যেন খেয়ে গেছে স্যার।' শিক্ষামন্ত্রীর গায়ে হয়তো এমনিভাবে অন্যের দুর্নীতির হাতের ছাপ পড়েছে। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় সেই 'অন্যদের' বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না বলেই তাঁর হাতের তালু থেকেই মন্ত্রণালয়ের অনেকের দুর্নীতির গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এখন তাঁর হাতে যাঁরা খেয়ে গেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে অপারগতার ব্যাখ্যাও পেতে হবে।

সর্বশেষ সংবাদ: আট মাসে শিক্ষামন্ত্রী যেকোনো কারণে যা পারেননি, তা ছয় দিনে সম্পাদনের দায়িত্ব এখন শিক্ষা উপদেষ্টার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে গুণী ও জ্ঞানী আকবর আলি খান একটি টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'উপদেষ্টা বাছাই করলেও চূড়ান্ত তালিকাটি তো শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই প্রকাশ করতে হবে।' ডিও লেটার বা অর্থ প্রদানের আদেশও মন্ত্রণালয় দেবে। অর্থাৎ সর্বশেষ প্রক্রিয়ার দায়ভার শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপর বর্তাবে। উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, মন্ত্রী আট-নয় মাসে তালিকাটি নিজেই পরিমার্জনা না করে শেষ মুহূর্তে এসে 'সরে দাঁড়ালেন' কেন? আমার সন্দেহ হচ্ছে, বর্তমান সরকারের এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া, ভণ্ডুল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়াতেই উপদেষ্টার কাঁধে সব ভার চাপিয়ে তাঁর এই বিলম্বিত 'সরে দাঁড়ানো'। এখন মন্ত্রী মহোদয় বিতর্কিত হওয়ার কারণটি ব্যাখ্যা করলে শিক্ষা উপদেষ্টার পক্ষে পুনর্মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই করার কাজটি সহজ হবে। এমপিওভুক্তির ভ্রম সংশোধন ও অনিয়মের সুরাহা করতে উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। তা হলেই আওয়ামী সরকারের প্রশংসনীয় কর্মসূচিটি সীমিত সময়ে সফল করা সম্ভব হবে। সকল বিতর্কের অবসান ঘটাবে।

● এবিএম মূসা : সাংবাদিক।